দৈনিক জনকণ্ঠ

৫/১০/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ব শিক্ষক দিবস

এবারের শিক্ষা ভাবনা

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় পর পরই এবারও আজ ৫ অক্টোবর শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অব্যাহত প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অধিকতর অনুকূল শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারণের অপরিহার্যতার আলোকে সারা বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে উদ্‌যাপিত হচ্ছে "বিশ্ব শিক্ষক দিবস"।

১৯৯৬ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃসরকার সম্মেলনে শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালা গৃহীত হওয়ার স্মারক দিন হিসাবেই এ দিনটি পালিত হচ্ছে বাংলাদেশে এবং বিশ্বব্যাপী। সংখ্যার দিক দিয়ে শিক্ষকরা আজ আর কম নয়। দুনিয়ার প্রায় ১ শতাংশ অধিবাসীই শিক্ষক সংখ্যায় ৬ কোটি। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল ফেডেরিকো মেয়রের প্রস্তাবক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ৫ অক্টোবর "বিশ্ব শিক্ষক দিবস" হিসাবে নির্ধারিত হয়। ৫ অক্টোবরকে বেছে নেয়া হয় এ জন্য যে যদি এ তারিখেই ১৯৯৬ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কোর সুপারিশমালায় গৃহীত হয় ও পরে আইএলও কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশের সরকারী-বেসরকারী স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী ৪টি শিক্ষক সংগঠন সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এ দিবসটি পালন করে আসছে ১৯৯৪ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক শিক্ষক সম্প্রদায়ের সাথে সংহতি বজায় রেখে।

শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কো-আইএলও-এর ১৪৫টি অনুচ্ছেদে শিক্ষা ও শিক্ষক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মধ্যে বলা হয়েছে যে, (১) শিক্ষা যেহেতু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত সেহেতু শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, (২) শিক্ষক সংগঠনগুলোকে সহায়ক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে। সেই জন্য শিক্ষক সংগঠনসমূহকে শিক্ষার নীতিনির্ধারণে সম্পৃক্ত রাখা উচিত, (৩) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের শিক্ষার সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে, (৪) শিক্ষকদের নিয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে কোন প্রকার বৈষম্য বাঞ্ছনীয় নয়, (৫) শিক্ষক সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তাঁদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে এবং এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরে শিক্ষকদের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি না হয়, (৬) শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'কর্তৃপক্ষ' নির্ধারিত থাকতে হবে, (৭) 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁদের পেশাগত দায়-দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবে এবং নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালায় শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি তাঁদের অধিকারও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ প্রভৃতি ইত্যাদি।

সাম্প্রতিক শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে জাতীয় সংবাদপত্র এবং অভিভাবকদের সাথে একাত্ম হয়ে শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজ শুধু আর্থিক সুবিধাদি আদায়ের জন্য সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলন পরিচালনার বদলে এবং প্রচলিত শিক্ষক আন্দোলনের ধারা পরিবর্তন করে ছাত্রছাত্রীদের যুগোপযোগী গুণগত শিক্ষাদান দ্বারা তাদের জন্য অভিভাবকদের শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ সার্থক করে তোলার লক্ষ্যে উন্নত শিক্ষাদানে সক্ষম একটি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক গোষ্ঠী গড়ে তোলার অপরিহার্যতার কথা বলতে শুরু করেছেন। শিক্ষকদের দিক থেকে সাহস করে এসব অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করা হলেও শিক্ষার মান উন্নয়নের স্বার্থে সমাজ, জাতীয় নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র তাদের দায়িত্ব কতটুকু সঠিকভাবে পালন করছে সে প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক। ভিন্নধর্মী পেশা হলেও শিক্ষকতা শুধুই মহান ব্রত--এ বক্তব্য আজ শিক্ষকদের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? বিশ্বব্যাপী শিক্ষকরা শিক্ষকতাকে আজ পেশা হিসাবে নিয়ে পরিবার-পরিজনসহ আয়েশে না হলেও স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনে আগ্রহী ও আন্তরিক। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা অথবা বিশ্ব মানের শিক্ষা দিতে হলে এ পেশায় মেধা আকর্ষণের যে বিকল্প নেই এ সহজ সরল রূঢ় বাস্তবতাও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। সে জন্যই শিক্ষক ও শিক্ষকতা পেশা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের কথা শিক্ষকগণ সংগঠিত হয়ে বলা শুরু করেছেন বেশ জোরেশোরেই। তাঁরা সমাজে তাঁদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার অকার্যকারিতাও তুলে ধরছেন।

"এ কথা সত্য, আজও সমাজের কাছে, অন্তত বাঙালী সমাজের কাছে, দরিদ্রতাই যেন শিক্ষকদের আদর্শ বৈশিষ্ট্য, শিক্ষকের নিরীহ জীবনাচরণই যেন সমাজের কাছে অধিকতর কাম্য। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ালগ্নে বাজার অর্থনীতির সংস্কৃতিতে, যা কিনা প্রকারান্তরে Consumer Society'র বিকাশে সহায়তা করে, সে অবস্থানে থেকেও সমাজের অন্য দশজন মানুষ থেকে শিক্ষককে আমরা স্বতন্ত্রভাবে দেখতে চাই। আমরা দেখতে চাই শিক্ষককে ষড় রিপুর প্রভাবমুক্ত একজন কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে। এই ঐতিহাসিক ধ্যান-ধারণার নিগড় থেকে আমরা আজও বেরিয়ে আসতে পারিনি। অথচ রক্ত-মাংসে গড়া সমাজ অভ্যন্তরে বসবাসরত অপরাপর মানুষের মতো একজন শিক্ষকেরও বহুমাত্রিক চাহিদা রয়েছে। সে দরিদ্রতার অভিশাপ মুক্ত হওয়ার প্রয়াসী, সেও বস্তুতান্ত্রিক সমাজের জীবনযাত্রার উপকরণসমূহ নাগালের মধ্যে পেতে চায়। এই উপলব্ধি বিবেচনায় রেখে শিক্ষকতার পেশায় মেধাবী আকর্ষণ করার এবং ধরে রাখার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। গতানুগতিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কতিপয় কলাকৌশল আয়ত্ত করানো সম্ভব হলেও উন্নত মেধা বিকাশের তেমন কোন সুযোগ নেই। শিক্ষিত বেকারত্বের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নিতান্তই দায়ে পড়ে মেধাবী কেউ কেউ শিক্ষকতায় এলেও, শিক্ষকতা পেশায় তাঁর অবস্থান ততদিনই থাকে যতদিন তিনি একটি ভাল "চাকরি" না পান। এই অবস্থার উত্তরণ প্রয়োজনই কেবল নয়, জরুরী প্রয়োজন বলে মনে করি।" (বর্তমানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর নাইয়ার সুলতানার প্রকাশিত লেখা থেকে উদ্ধৃত)

এ লেখার শুরুতে সংসদ নির্বাচনের উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, দু'টি বড় রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার এবং নির্বাচনী সভাসমূহে শিক্ষা ও শিক্ষকদের নিয়ে বেশ কিছু বক্তব্য এসেছে। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপসহ বেসরকারী স্কুল, কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রারম্ভিক বেতনের (পুরো স্কেলের নয়) সরকারী অংশ বর্তমানে প্রদত্ত শতকরা ৯০ ভাগ থেকে ১০ ভাগ বাড়িয়ে ১০০ ভাগে উন্নীত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন দুই প্রধান জাতীয় নেত্রী। উল্লেখ্য, ফেডারেশনের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ হাসিনা বর্তমানে প্রচলিত দুর্নীতিযুক্ত ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগপ্রথার পরিবর্তে পৃথক পাবলিক সার্ভিস [illegible] কমিশনের মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ এবং মেধাবী ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকর্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য পৃথক জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। একইভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রকাশিত প্রথম নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বেসরকারী শিক্ষকদের সরকারী কোষাগার থেকে ৯০%-এর পরিবর্তে ১০০% প্রারম্ভিক বেতন প্রদান এবং শিক্ষকদের দাবিসমূহ মেনে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনা দুই জাতীয় নেত্রীই দেশব্যাপী সভা-সমাবেশে এসব ঘোষণা ও অঙ্গীকার অব্যাহতভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং তা শিক্ষকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আমরা শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের কথা শুনি ও বলি। শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষকের বিকল্প নেই। তাই শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সদ্য প্রকাশিত বিএনপি ও আওয়ামী লীগের এবং অন্যান্য রাজনৈতিক জোট ও দলের নির্বাচনী ইশতেহারে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য প্রারম্ভিক ১০০ ভাগ বেতন প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। তবে সবিনয়ে বলতে চাই, এই ব্যবস্থা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। বর্তমানে প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কি সরকারী, কি বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য যে বেতন কাঠামো রয়েছে তা দিয়ে শিক্ষকতা পেশায় মেধা আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষকদের জন্য পৃথক জাতীয় বেতন স্কেলের দাবি করছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্র ঝরে যাওয়ার মতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিক্ষকও ঝরে যায়। বিশেষ মেধাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও কিছুদিন পরই তাঁরা অন্য পেশায় চলে যান। এ বছর বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, নিয়োগকৃত মোট শিক্ষকের ৬৫% তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষক। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, মেধাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ শিক্ষকতা পেশার প্রতি আদৌ আগ্রহী নয়। তাই শিক্ষার মান উন্নয়নের স্বার্থেই অবিলম্বে শিক্ষকদের জন্য পৃথক জাতীয় স্কেল প্রবর্তন সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবি রাখে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক জাতীয় স্কেলের সপক্ষে আরও উল্লেখ করা যায় যে, বেসরকারী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী প্রফেসরের বেতন-ভাতা যেখানে ৭৯ হাজার ৬৮০ টাকা সেখানে দেশের প্রাচীনতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর বেতন-ভাতা পান ১৬ হাজার ৩৮০ টাকা। ক'দিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকে খবর বেরিয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শতাধিক শিক্ষক অনুমতি ছাড়াই কনসালটেন্সিতে নিয়োজিত রয়েছেন এবং ১১১৮ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১২ জন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।

শিক্ষার মান বৃদ্ধি মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার অপরিহার্যতার সাথে সাথে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষার দায়িত্ব বহনকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্র থেকে ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে যে নিদারুণ ও অমার্জনীয় বৈষম্যের শিকার তারও অবসান অত্যাবশ্যক। সরকারের সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি : সরকারী একজন স্কুল ছাত্রের পিছনে সরকারের বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ হলো ৩ হাজার ৩৫৬ টাকা, অন্যদিকে বেসরকারী একজন স্কুল ছাত্রের জন্য সরকার ব্যয় করছে বছরে মাত্র ৯৭২ টাকা। সরকারী মাদ্রাসার একজন ছাত্রের জন্য সরকারের আর্থিক বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ ৬ হাজার ২৫৪ টাকা, অন্যদিকে বেসরকারী মাদ্রাসার একজন ছাত্রের জন্য সরকারের বছরে ব্যয় মাত্র ১ হাজার ১৮৩ টাকা। সরকারী কলেজের একজন ছাত্রের জন্য সরকার ব্যয় করছে বছরে ১৪ হাজার ৯৩৩ টাকা, অন্যদিকে বেসরকারী কলেজের একজন ছাত্রের জন্য সরকার ব্যয় করছে বছরে মাত্র ১ হাজার ৬৮৯ টাকা। ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের জন্য সরকার ব্যয় করছে বছরে ৫৬ হাজার ৫৩৭ টাকা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মাথাপিছু সরকার বছরে ব্যয় করছে ৩৭ হাজার ২০১ টাকা, যদিও বেসরকারী যেসব কলেজে অনার্স বা মাস্টার্স রয়েছে তাদের জন্য সরকারের এক পয়সাও বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ নেই।

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে উপরোক্ত পর্বতপ্রমাণ বৈষম্যই শুধু নয়, এশিয়ার মধ্যে সম্ভবত বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যহীন অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকট প্রাধান্য বিরাজমান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সেখানে কার্যত স্থান নেই। অথচ চীনে মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ৯.১ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৮.৬ শতাংশ, পাকিস্তানে ১.৬ শতাংশ আর বাংলাদেশে মাত্র ০.৭ শতাংশ শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত। শিক্ষা দ্বারা কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ মানব সম্পদ উন্নয়নের এদিকটি বাংলাদেশে মারাত্মকভাবে অবহেলিত। অর্থাৎ বাস্তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের আদৌ কোন দিকনির্দেশনা বা লক্ষ্য নির্ধারিত নেই। তাই প্রয়োজন বা জনসংখ্যা বিবেচনায় না নিয়ে দলমত নির্বিশেষে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং জনপ্রতিনিধিদের অনেককেই জাতীয় স্বার্থপরিপন্থী একটি আত্মঘাতী খেয়াল চরিতার্থ করতে দেখা যায়– তাহলো যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। অথচ এর মাসুল দিতে হচ্ছে গোটা জাতিকে আর্থিক দিক দিয়ে বছরের পর বছর। শুধু তাই নয়, এ প্রবণতা দিনের পর দিন বাড়ছেই। গত ২ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিকেও (প্রথম আলো) গত ক'বছরে প্রতিষ্ঠিত কমপক্ষে ৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গসহ সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁরা সরকারী বা বিরোধী যে দলেরই হোন না কেন, তাঁদের জাতীয় সম্পদ ও অর্থ অপচয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না কেন? গতানুগতিক স্কুল-কলেজ স্থাপন না করে তাঁরা তো উদ্যোগ নিতে পারতেন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং কম্পিউটার স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে যাতে করে নতুন করে বেকার সৃষ্টির বদলে তরুণ সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়? এতে তো তাঁরা দেশ ও সমাজের কল্যাণে যথার্থই অবদান রাখতে পারতেন। বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজার কম্পিউটার প্রোগ্রামার নিয়োগ দেয়ার জন্য জার্মান টিম এসে যখন মাত্র ১৯ জনকে খুঁজে পায় তখন গতানুগতিক স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতাদের সত্যিই ধন্যবাদ দেয়া যায় না। আর জনপ্রতিনিধিরা জাতীয় স্বার্থের নিরিখে কাজ করবেন না এটা ভাবতেও কষ্ট লাগে।

এবারের "বিশ্ব শিক্ষক দিবসে" বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজের তাই ধ্বনি হলো– মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও শিক্ষকের মান একই সাথে বাড়াতে হবে। দু'চার দশ ভাগ বেতন বৃদ্ধি নয়, মেধাবীদের শিক্ষকতায় আকর্ষণে সক্ষম পৃথক জাতীয় বেতন স্কেল ও অব্যাহত প্রশিক্ষণ চাই। চাই বৃত্তি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা। আর চাই ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালার আলোকে শিক্ষকদের প্রাপ্য আর্থ-সামাজিক মর্যাদার পুরোটা। প্রগতির অভিযাত্রায় এ চাওয়ার যে কোন বিকল্প নেই আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব যত শীঘ্র তা অনুধাবন করবে ততই তাদের জন্য এবং দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।